বাংলাদেশ ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

০ 1 FEB 1989

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

47

১৮

পরীক্ষার খাতায় মনগড়া নম্বর

পরীক্ষকের সততা ও নিরপেক্ষতা একবার বিতর্কের বিষয় হয়েছিল ষাটের দশকের শুরুতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র তার এমএ ফাইনালের ফল মেনে নিতে পারেননি। তিনি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তার দাবী এমএ ফাইনালে তিনি যেমন পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথমের নিচে হতে পারেন না কোন মতেই। কিন্তু ঘোষিত ফলে তার স্থান ছিল নিচে। তিনি অভিযোগ করেন, বিভাগীয় প্রধান বিদ্বেষবশত ইচ্ছে করে তাকে কম নম্বর দিয়েছেন। ঘটনাটি বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, ঘটিয়েছিল একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা। কোন শিক্ষক স্রেফ বিদ্বেষবশত কোন ছাত্র-ছাত্রীর ফল খারাপ করে দিতে পারেন, সেদিন এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল সমাজের পক্ষে। সুতরাং অভিযোগটির সত্যাসত্য যাচাই-এর ব্যবস্থা হয়েছিল, ঘটনা গড়িয়েছিল বিচার-বিভাগীয় তদন্ত পর্যন্ত। সেদিন যে কাজ অবিশ্বাস্য বলে মনে করা হত, আজকাল তা বহু-ক্ষেত্রেই ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে, হেরফের ঘটছে পরীক্ষার ফলে।

একশ্রেণীর শিক্ষক সম্পর্কে এখন নানারকম অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কারও কারও অভিযোগ স্কুলের কিছু কিছু শিক্ষক স্কুলের লেখাপড়ার চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোতে বেশি উৎসাহী ও ব্যস্ত। তারা হেরফেরও ঘটান পরীক্ষার ফলে।

পরীক্ষার হলে উত্তর তৈরিতে সাহায্য করা, খাতা-বদল খাতার নম্বর কম-বেশি করা ইত্যাকার অভিযোগ প্রায় প্রতি বছরই উঠছে। স্ট্যান্ড করা ও ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নাকি বেশি ঘটছে। স্কুলে স্কুলে ও কলেজে কলেজে রেষারেষির কারণেও এমন ব্যাপার ঘটার অভিযোগ রয়েছে। কারণ যা-ই হোক, প্রায় প্রতি বছরই সেকেন্ডারী ও হায়ার সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলে বেশ বড় রকমের ভুল-ভ্রান্তি ঘটে চলেছে।

পরীক্ষকের অসাধুতা, নিষ্ঠার অভাব ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ যে অসত্য নয়, একথা জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল বারীর বক্তব্য থেকে। গত ৩১শে জানুয়ারী পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষা সপ্তাহ '৮৯ উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি জানান, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক পরীক্ষার খাতা না দেখেই নম্বর দিয়েছেন এবং ফেল করিয়েছেন প্রায় সকল পরীক্ষার্থীকে। তিনি একটি বিষয়ের দুই পেপারের মোট আড়াই হাজার খাতা পেয়েছিলেন। তিনি ওগুলি খুলেও দেখেননি। মন যাকে যেমন চায় তেমন নম্বর দিয়েছেন। এতেই অকৃতকার্য হয়েছে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। এ ধরনের ঘটনা আরও থাকা অস্বাভাবিক নয় বলে অধ্যাপক বারী মন্তব্য করেছেন।

পরীক্ষার ফলাফলকে প্রায় সবাই ভাগ্য বলে মেনে নেয়। শুধুমাত্র খুব ভাল ছাত্র-ছাত্রী আশানুরূপ ফল না হলে চ্যালেঞ্জ করে, উত্তরপত্র পুনর্পরীক্ষার আবেদন জানায়। অন্যদের ব্যাপারটা কপালে করাঘাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারেনি এ জন্যে যে বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই ফেল করেছে। ফেলের বদলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী যদি পাস করে যেত, তাহলে বোধহয় কেউ ততটা উচ্চবাচ্য হত না। মনে ক্ষোভ থাকলেও তারা মেনে নিত ফল।

পরীক্ষা যে একটা বড় প্রহসনে পরিণত হয়েছে, আলোচ্য ঘটনা তার আরেকটি পরিষ্কার প্রমাণ। নকলের হিড়িক, গণটোকাটুকি, পরীক্ষা হলের বাইরে থেকে উত্তর বলে দেয়া, খাতা বদল, খাতার পেছন পেছন পরীক্ষকের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া ইত্যাদি পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই একরকম অসম্ভব করে তুলেছে। এতদিন এইসব অসাধু উপায় অবলম্বনে সবটা দোষ পড়ত পরীক্ষার্থীদের উপর। এক শ্রেণীর শিক্ষকের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কিছুটা চাপা অভিযোগ থাকলেও সোচ্চার হত না কেউই। কিন্তু এবার হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান নিজেই। উপরোক্ত এবং তার মত মুষ্টিমেয় অন্যান্য শিক্ষক সমগ্র শিক্ষক সমাজের মুখে কলংকের কালিমা মেখে দিয়েছেন।

সবদেশে বিশেষ করে আমাদের সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা ও অবস্থান খুবই উচ্চে। কেবল ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, তাদের অভিভাবকদের কাছেও শিক্ষকগণ পরম শ্রদ্ধাভাজন। এই শ্রদ্ধার পেছনে রয়েছে সমাজের একটি গভীর বিশ্বাস: মা-বাবা শুধু মূর্তি (ছেলেমেয়ে) বানান, শিক্ষকরা তাদের গড়ে-পিটে মানুষ করেন। এ কারণেই শিক্ষকদের প্রতি সবার অকুণ্ঠ আস্থা, সর্বোচ্চ মর্যাদা।

আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অধিকাংশ শিক্ষায়তনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়মিত চলে না বললে মিথ্যা বলা হবে না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শিক্ষার মানও নেমে গেছে। এই পরিস্থিতি দুই তিন দশকের অবহেলা-উদাসীনতারই অশুভ ফসল। বর্তমানে সরকার ও সমাজ উভয়েই এই অবস্থার অবসান ঘটাতে চাচ্ছেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও নিয়ম-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দীর্ঘলালিত মূল্যবোধের উজ্জীবন এবং শিক্ষা মান উন্নয়নের জন্য চলছে আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারকে দায়িত্ব পালন করতে হবে যুগপৎভাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ব্যাপারে শিক্ষক সমাজের দায়িত্বটাই প্রধান। পরিস্থিতি পরিবর্তনে তারা অর্থবহ অবদান রাখতে পারেন। দলাদলিতে লিপ্ত না হয়ে, অর্থ উপার্জনের জন্য বেনিয়াবৃত্তিতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তারা যদি মিশনারীদের নিষ্ঠা ও শিক্ষকদের চিরন্তন মূল্যবোধ নিয়ে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ বাড়বে। তাই শিক্ষক সমাজেরও আত্মসমালোচনা ও আত্ম সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কাজের জবাবদিহির ব্যবস্থা তাদের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে নিয়মভঙ্গকারী ও দোষীদের। অবশ্য তার আগে দরকার শিক্ষক সমাজের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা। একই সঙ্গে চালাতে হবে ভূত তাড়াবার সর্ষের ভূত নির্মূলের প্রচেষ্টা। অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অনাগ্রহী এবং দায়িত্ব পালনে উদাসীন শিক্ষকদের চিহ্নিত করে সংশোধন করতে হবে।

দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে একদিকে যেমন যুগোপযোগী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে, অন্য দিকে তেমনি নিশ্চিত করতে হবে নিয়মিত শিক্ষাদান ও পরীক্ষা খাতার সঠিক মূল্যায়ন। খাতা না দেখে মনগড়া নম্বর দিলে পরীক্ষার্থীদের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হয় বেশি। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। এই অকল্যাণের অভিশাপ থেকে ছাত্র সমাজ ও শিক্ষাকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে—এটা প্রত্যাশিত। শিক্ষক ও পরীক্ষকদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস আছে, তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

—সমদর্শী